অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আমার মন কেমন করে ।।

১.

আমার কলামের প্রিয় পাঠকদের সর্বাগ্রেই ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখি। যদিও ঈদের নামাজে ইমাম সাহেব তাঁর খুৎবায় বারংবার বলছিলেন মুসলিম উম্মার একতা আর সৌহার্দের কথা কিন্তু সেই একতার অভাবে আমরা সিডনিতে দু'দিনে ঈদ পালন করলাম। দু'দিনের অপশন থাকাতে এখন যে যার সুবিধা মত দিনে ঈদ পালন করছেন। ওখানে ধর্মের বিধিনিষেধ আর টিকছে না যার ফলে কেউ কেউ ঈদের দিন রোজা রাখছেন (যেটা ধর্মীয়ভাবে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) আবার কেউ একটি রোজা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্য কোন ধর্মালম্বীদের মাঝে এই সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। জানি না কারা সঠিক। উনত্রিশ রোজাতেও ইফতার করলাম আমরা হয় ঘড়ি দেখে নয়তো রেডিও টিভিতে আযান শুনে কিন্তু পরক্ষণে চাঁদ না দেখে ঈদ করা সম্ভব হলো না। সেখানে ঘড়ি ক্যালেন্ডার, টেকনোলজি সবই অগ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আগামী দশ বিশ বছরে কবে কখন চাঁদ সূর্য উঠবে সবই জানা যায় - কোন হেরফের হয় না, কারণ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এর কোন হেরফের করেন না। এখানে অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ইমাম কাউন্সিল আছে যাঁরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন ঈদ রোজার ব্যাপারে যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক সাথে ঈদ করতে পারে। যাঁরা এ কাউন্সিলের মেম্বার নন তাঁরা কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মানতে অপরাগ। ফলে আনন্দের ঈদ নিরানন্দই রয়ে যায়। বাবা মা একদিন আর ছেলে মেয়েরা হয়তো ঈদ করেন অন্যদিন। এ বন্ধুরা ঈদ আজ করেন তো ওই বন্ধুরা কাল। কারা সঠিক একমাত্র আল্লাহতায়ালাই বলতে পারেন।

শুধু এখানেই নয়। বাংলাদেশেও সাতচল্লিশটি গ্রাম আছে যেখানে তাঁরা ঈদ করেন সেদিনই যেদিন সৌদি আরবে ঈদ। তাঁদের পক্ষেও যুক্তি আছে হয়তো। সেই কাজীর দরবারের বিচারের কথা মনে হলো। কাজী বাদীকে বলছেন - বল তোমার কি আর্জি। আর্জি শুনে কাজী বললেন - ঠিক আছে। এবার বিবাদীকে বললেন তার আর্জি পেশ করতে। বিবাদীর আর্জি শুনে কাজী বললেন ঠিক আছে। এরমধ্যে উপস্থিত একজন সাক্ষী বললেন - হুজুর বাদী-বিবাদী উভয়কেই বললেন ঠিক আছে এটা কেমন বিচার? কাজী বললেন - আপনি যেটা বলছেন সেটাও ঠিক আছে। তো সেই কাজী সাহেবের কথার রেশ নিয়ে বলতে হয় সবাই ঠিক আছে। সবাই ঠিক করছে কেবল বেঠিক হয়ে যাচ্ছে ঈদের আনন্দটা। আমাদের প্রজন্ম এটা দেখেই বড় হচ্ছে খুশীর ঈদ নিয়ে আমরা একমত হতে পারি না। সঠিক জানতে পারিনা কবে ঈদ। আমাদের বাঙালি কম্যুউনিটি ছাড়া অন্য কম্যুউনিটির মানুষ যেদিনই ঈদ করুক তারা একদিনে করছে। কেবল আমরাই একই দিনে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। এবারেও গোটা আমেরিকা কানাডায় বাঙালিরা একই দিনে ঈদ করছে। জানিনা আমরা কবে পারবো।

এবারের ঈদ আরো নিরানন্দের হলো গাজা-র নিহত-আহত শিশুদের মুখ গুলো মনে করে। মুসলিম উম্মাহর অংশ ওরা তথাপি অনেক মুসলমান এবং মুসলিম দেশের নীরবতায় হতাশ হয়েছি। যুদ্ধের তিন সপ্তাহর মাথায় ঈদের পর ঘুম ভাঙ্গলো সৌদি বাদশাহর। তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন গাজায় আগ্রাসনের কথা বলে কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্পিকটি নট। কেউ কেউ বলেন ইসরাইলের এই আগ্রাসনের পিছনে তাঁদের এক ধরণের নীরব সমর্থন রয়েছে। কারণ হামাসকে তাঁদের ভয়। তাঁদের রাজতন্ত্রের প্রতি যারাই হুমকি সে আল-কায়দা হোক আর হামাসই হোক কাওকেই তাঁরা সুনজরে দেখেন না। যাহোক, এ লেখা যখন লিখছি তখন গাজায় ৭২ ঘন্টার মানবিক যুদ্ধ বিরতি সম্মতির দু'ঘন্টার মধ্যেই ইসরাইলের মিসাইল বর্ষন শুরু হয়ে গেছে। সে আক্রমণে আরো ৫০ জন নিহত। হতাহতের পুরো খবর তখনো জানা যায়নি। এ নিয়ে গাজায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫০০-র অধিক। আহত দশ হাজার। শরনার্থী দু'লাখ। সারা বিশ্ব এর বিরুদ্ধে সোচ্চার তথাপি ইসরাইলের বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার ইচ্ছানুসারেই চলছে সব। ভিন্নধর্মী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার কাছে এ বিষয়ে কিছু প্রত্যাশা মানেই মেঘলা আকাশের

কাছে আলোর আবদার। তিনি চাইলেও কিছু করতে পারবেন না কারণ তাঁর হাত পা বাঁধা। তাইতো প্রেসিডেন্ট হবার পর পরই কোন এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষনা দিয়েছিলেন - ইসরাইলকে ১৯৬৭-র রেজুলেশন মেনে নিয়ে পালেস্টাইনের অধিকৃত অংশ ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি বুঝতে পারেননি এ কথা কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের জন্য বলা হারাম। নিজের বোধ থেকে বললেও প্রশাসন তাঁকে তা বলতে দিতে রাজী নয়। তাঁর গদি উল্টে যায় যায়। আঁচ করতে পেরে তিনি চেপে গেলেন। বুঝে উঠতে পারেননি প্রেসিডেন্টকে নেপথ্যে যারা চালায় তারা অধিকাংশই ইহুদী।

২.
১৯৬৭-র রেজুলেশনটা তবে কী - একটু পেছনে ফেরা যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কি উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর প্যালেস্টাইনসহ বেশিরভাগ আরব এলাকা চলে যায় ইংল্যান্ড- ফ্রান্সের ম্যান্ডেটে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। ১৯১৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের সহযোগিতায় প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ হাজারে। এরপর প্রকাশ্যে প্যালেস্টাইনে ইহুদী অভিবাসীদের ধরে এনে জড়ো করা শুরু হলো ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ এবং ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের সংখ্যা দাঁড়ালো ৬ লাখে।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং পরমাণু সূত্রের উদ্ভাবক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইহুদী ধর্মাবলম্বী। কথিত আছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ইহুদীদের কোন রাষ্ট্র না থাকার কারণে আক্ষেপ করতেন। তিনি ইহুদীদের জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টির দাবি করেছিলেন। তাঁর দাবির সূত্র ধরেই ব্রিটেন ও জার্মানিসহ অন্যান্য দেশে বসবাসকারী ইহুদীরা সংগঠিত হতে থাকে। ব্রিটেন ইহুদীদের রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারী মি. বেলফোর কর্তৃক ১৯১৭ সালে ঘোষিত 'বেলফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির বীজ বপিত হলো। বেলফোর ঘোষণার সূত্র ধরেই ব্রিটিশ শাসিত প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে গণভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং পশ্চিমাদের প্রভাব এবং চাপে এ গণভোটের রায় চলে গিয়েছিল ইসরাইলের পক্ষে। জাতিসংঘের তথাকথিত ১৮১ নং প্রস্তাবের পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে অখন্ড প্যালেস্টাইনকে দ্বিখন্ডিত করা হলো। এ প্রস্তাবে প্যালেস্টাইন ও ইসরাইল নামে ২টি দেশের কথা বলা হলো। জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে দ্বিখন্ডিত করার প্রস্তাব পাশ করে নিজেদের মাতৃভূমির মাত্র ৪৫ শতাংশ প্যালেস্টাইনীদের এবং বাকি ৫৫ শতাংশ ভূমি ইহুদীবাদীদের হাতে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ প্রস্তাবের আলোকে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু আমেরিকা, ব্রিটেন ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রে জাতিসংঘ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিলেও প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিলো না। এ সুযোগে ইসরাইল আমেরিকার সামরিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতায় মিসর, জর্ডান ও লেবাননসহ দূর্বল আরব দেশগুলোর ভূমি দখল অব্যাহত রাখলো।

ইসরাইলের অব্যাহত আরব ভূমি দখলের কারণে ১৯৬৭ সালে ৫ জুন মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এ যুদ্ধের আগে ইসরাইল তার নির্ধারিত সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম তীর, গাজা ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নিল। ছয়দিনের যুদ্ধের ব্যাপক আগ্রাসনে ইসরাইল গোটা জেরুজালেম দখলে নিল। তাদের দখলে তখন মিসরের সিনাই অঞ্চল, প্যালেস্টাইনের আরব অংশ বা ওয়েষ্ট ব্যাংক অব জর্ডান, গাজা স্ট্রিপ, গোলান মালভূমি - সবই। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ১৯৬৭ সালে ২৪২ নং প্রস্তাব গ্রহণ করলো। এ প্রস্তাবে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরব দেশগুলোর কাছ থেকে দখলে নেয়া ভূখন্ড থেকে ইসরাইলী সেনা প্রত্যাহার করে নেয়ার কথা বলা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ওবামা এই প্রস্তাবের প্রতিই মূলতঃ ইঙ্গিত করেছিলেন।
যাহোক যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত প্যালেস্টাইনিরা সংগঠিত হয়ে ১৯৮০ সালে গঠন করলো প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)। পিএলওর মাধ্যমে ইসরাইলী দখলদারিত্ব নির্যাতিত-নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হলো। ১৯৬৫ সালে কুয়েতে চাকুরী করবার সময়ই চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গেনাইজেশন বা পিএলও এবং আল ফাতাহ নামের সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলেন। তখন থেকেই মূলতঃ তাঁর প্যালেস্টাইনীদের জন্য মুক্তি সংগ্রাম। সেই থেকেই চেয়ারম্যান আরাফাত তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সংগ্রাম করেন

ইসরাইলীদের বিতারিড়ত করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। ১৯৯৪ সালে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের মধ্যস্থতায় তৎকালীন ইসরায়েলী প্রধানমন্ত্রী ইজহাক রবিন এবং ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট আরাফাতের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হলো। সেই চুক্তির বলে ১৯৬৭ তে দখলীকৃত ফিলিস্তিনী এলাকা গুলোকে সীমিত স্বায়ত্বশাসন দেয়া হলো। সেটুকুতেই আপাতত স্বস্তি খুঁজে প্রেসিডেন্ট আরাফাত পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে ক্রমশ:ই এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

বিধি বাম। এগুনো আর হলো না। শান্তি চুক্তি করার অপরাধে ইজহাক রবিন আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। পরিবর্তে যমদূতরূপে আবির্ভূত হলেন যুদ্ধবাজ জেনারেল এরিয়েল শ্যারন। ক্ষমতায় এসেই নানান ছুঁতোয় লংঘন করা শুরু করলেন শান্তিচুক্তি। কারণে অকারণে ট্যাংক আর হেলিক্যাপ্টার গানশিপ নিয়ে ইসরাইলী বাহিনী অনবরত ঝাঁপিয়ে পড়লো ফিলিস্তিনীদের আঙ্গিনায়।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট বুশ তথাকথিত মিডিল ইষ্ট রোড ম্যাপের ফতোয়া দিলেন। আরাফাত তা সর্বাংশে মানতে রাজী নন যেহেতু রোড ম্যাপে মূলতঃ ইসরাইলীদের স্বার্থই রক্ষা করা হয়েছে। রোড ম্যাপের ফতোয়া পুরোপুরি মানলেন না বলে বুশ সাহেবের দারুণ গোস্‌সা। ক্ষিপ্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট আরাফাতকে পদত্যাগ করতে বললেন। প্যালেস্টাইনীরা প্রেসিডেন্ট বুশের এই ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হলেন কয়েকগুন। শেষমেষ প্রেসিডেন্ট বুশ নতুন এক ছবক দিলেন। সেই ছবকের আওতায় আরাফাতকে প্রেসিডেন্ট রেখেই একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হবে। উদ্দেশ্য, যেহেতু প্রেসিডেন্ট আরাফাতকে বাগে আনা যাচ্ছে না অতএব তাঁকে আড়ালে রেখে এই প্রধানমন্ত্রীর সাথে রোড ম্যাপ বাস্তবায়িত করতে হবে। সে সূত্র ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের মনোনীত মাহমুদ আব্বাস হলেন প্যালেস্টাইনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সাথে প্রেসিডেন্ট আরাফাতের সম্পর্ক সুমধুর হয়নি। পাশাপাশি প্যালেস্টাইনী সংগ্রামীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আলফাতাহ থেকে হামাসসহ নানান দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এই বিভক্ততাই ইসরাইলীদের আরো সাহসী এবং সুবিধাভোগী করে তোলে। এ দলগুলোর মধ্যে হামাস বেজায় উগ্র বিধায় তারা কোন ধরনের খন্ডকালীন বা আংশিক শান্তি চুক্তিতে আগ্রহী নয় পক্ষান্তরে ইসরায়িলীরা হামাসের সাথে কোন ধরণের আলাপ আলোচনাতেই বসতে নারাজ। সোজা কথায় ওরা সব সহ্য করতে রাজি কেবল হামাস ছাড়া। কিন্ত সেই হামাসই পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে অবরুদ্ধ প্যালেস্টাইনের সরকার নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব নেয় আর তখনই ইসরায়িল হয়ে ওঠে বেপরোয়া। হামাস-ফাতাহ দ্বন্দ ও প্রভাবশালী আরব দেশগুলোর স্বার্থপর ভূমিকা প্যালেস্টাইনীদের স্বাধিকার অর্জনের পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ। এরমধ্যেই প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করে। বর্তমানের প্যালেস্টাইনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ১৯ নভেম্বর ২০১২ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোতে সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, প্যালেস্টাইন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জনের লড়াই অব্যাহত রাখবে। এরপর ইসরাইল প্যালেস্টাইনে হামলা আরো তীব্র করে। ওরা গোটা প্যালেস্টাইন থেকে প্যালেস্টাইনীদের নিঃশেষ করতে বদ্ধপরিকর।
প্যালেস্টাইনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের আত্মবিশ্বাসী ঘোষণার মাত্র ১০ দিন পর সদস্য দেশগুলোর ভোটের রায়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল প্যালেস্টাইন।

ইসরাইল আর প্যালেস্টাইন - দুই রাষ্ট্র সমাধান (Two State solution) নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ইসরায়িলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতিনিয়াহু আর বর্তমান পিএলও প্রধান মাহমুদ আব্বাস একটি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী গ্রুপ the Quartet on the Middle East (the Quartet) নামে যার সদস্য আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইউ) এবং জাতিসংঘ। কিন্তু ২০০৬ সালের নির্বাচনে হামাস কর্তৃত্ত নেয়ার কারণে আমেরিকা এবং ইউ হামাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং প্যালেস্টাইনে সকল আর্থিক ও ত্রাণ সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়। এর পরের বছরই ২০০৭ এ প্যালস্টাইন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেলেও রাজনৈতিক ভাবে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর ফলে ওয়েস্ট ব্যাংক চলে যায় ফাতাহ-র নিয়ন্ত্রনে আর গাজা স্ট্রীপ পায় হামাস। যেহেতু হামাসকে ইসরায়িলীরা কোনভাবে মেনে নিতে পারছে না সে কারণে তারা অধিকৃত গাজা ছাড়তে নারাজ। তেমনি হামাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইসরাইলকে গাজা ছাড়তে বাধ্য করবে

যতদিন লাগুক। তাই মনে হয় না এ যুদ্ধের সহসাই কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। কেবল হতভাগ্য নারী শিশুরা জানে না ওদের কী অপরাধ।

৩.

যেমন হতভাগ্য রাসেল, সুলতানা, রোজি জানলো না তাদের কী অপরাধ? কী অপরাধ কামাল জামাল বেগম মুজিবের? কী অপরাধ ছিলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের? যে পিতা একটি জাতিকে একটি দেশ দিলেন - দিলেন জাতীয় পরিচয় তাঁকেই সে জাতি হত্যা করলো। সেটাই বোধ করি ছিলো জাতির পিতার অপরাধ। পিতা - আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা বড়ই হতভাগ্য আপনাকে আপনার পরিবারকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এ দুঃখ আমাদের আজীবনের। এ শোক আমাদের চিরদিনের। আপনি যেখানেই থাকুন ভাল থাকুন। আমাদের ক্ষমা করে দিন। এ শোকের মাসে এটাই আমাদের প্রার্থণা।

নিরানন্দ ঈদ, রক্তাক্ত প্যালেস্টাইন, শোকে বিহ্বল আগস্ট... ... আমার মন কেমন করে